হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। খুলনা শহরে লাঠি ও বন্দুক নিয়ে জনতা একটি হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রদেশের অভ্যন্তরের অন্যান্য এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে ব্যাপক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছে ও সারা প্রদেশের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেলি-যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম বিভাগের কর্মচারীরা বার্তা গ্রহণ ও প্রেরণ বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

৬ই মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৫ ও ৬ই মার্চের রাতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা বৃটিশ কাউন্সিল ভবনে ঢুকে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সময়মত সেনাবাহিনী পৌঁছায় এবং গুলী ছুড়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩৪১ জন কয়েদী পালিয়ে যায়। পুলিশ গুলী ছোড়ার ফলে ৭ জন কয়েদী নিহত হয়। ১ জন পুলিশ সার্জেন্ট এবং ৬ জন ওয়ার্ডার আহত হয়। পরে, পলায়নকারী কয়েদীরা আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থী এবং ছাত্রদলের সহযোগিতায় মারাত্মক শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকার রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে।

আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মীরা এসিড্ এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করার জন্য বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলো লুঠ করা শুরু করে। ঢাকায় সরকারী বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে সব বিস্ফোরক রাসায়নিক লুঠ করে নেয়া হয়।

এই একই উদ্দেশ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও আক্রমণ করা হয়। যখন গুলী ছোড়া হয়, তখন গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। কুমিল্লা ও যশোরসহ পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রধান প্রধান শহর থেকে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। ফরিদপুরের 'রাজেন্দ্র কলেজ ট্রেনিং কোর' এর ১০টা রাইফেল এবং ১৫টি বেয়নেট চুরি হয়।

চট্টগ্রামে লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ চলতেই থাকে। দু'টো দালান এবং কিছু সংখ্যক কুঁড়েঘর পোড়ানো হয়। আড়াল থেকে অতর্কিতভাবে গুলী ছোড়ার ঘটনাও বেশ কয়েক জায়গায় ঘটে।

রাজশাহীতে সদর ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে আগুন লাগানো হয়।

খুলনায় জাতি এবং রাষ্ট্র-বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষুব্ধ মিছিলসমূহ অস্ত্রের দোকানগুলো লুঠ করার চেষ্টা করে। দোকানের মালিক গুলী ছোড়ার ফলে ১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

৭ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রতিদ্বন্দী সরকার চালাবার কথা ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি নির্দেশ জারী করেন। অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন

চালিয়ে যাবার জন্যে' তিনি সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী প্রকাশ করেন। যেটা ২রা মার্চ (শুরু হয়েছিলো) কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো (১) কর না দেওয়া আন্দোলন (২) "সারা বাঙলা দেশের" শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসগুলো, হাই কোর্ট এবং অন্যান্য কোর্ট বন্ধ করে দেওয়া। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমূহকে আওয়ামী লীগের কর্ম-পন্থা অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হলো এবং এও জানানো হলো যে এ নির্দেশ অমান্য করলে মনে করা হবে যে 'এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বাঙ্গালীরা সহযোগিতা করছে না।' পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ বন্ধ করা হলো। এক নির্দেশে বলা হলো "ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পয়সা পাঠাতে পারবে না।" আর এক নির্দেশে বিশেষ করে উল্লেখ করা হলো যে প্রত্যেক ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা মহকুমা এবং জেলায় 'স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটা করে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

ঢাকায় রেডিও পাকিস্তান ভবনের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর পাওয়া যায় যে আওয়ামী লীগ ছাত্রদলরা জোর করে জীপ, পিক্ আপ এবং মাইক্রোবাস নিয়ে যাচ্ছে।

যশোর জেলায় বারগানায় পাকিস্তান জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

৮ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় যাদের লাইসেন্স রয়েছে তাদের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী সংগ্রহ করতে লাগলো। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহর থেকেও অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ সারা প্রদেশ জুড়ে মিটিং এবং উন্মত্ত মিছিলের ব্যবস্থা করলো। জাতীয়তাবাদ এবং পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগান ছিলো তাদের মুখে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ "শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশের কতকগুলি ব্যতিক্রম ও ব্যাখ্যা" ঘোষণা করলেন। এর মধ্যে ছিলো "ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনভাবে বাংলা দেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।"

৯ই মার্চ, ১৯৭১

বাংলা দেশের বাইরে যাতে ধনসম্পদ না যায়, সেজন্য আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা এবং ছাত্রদল ঢাকার বিভিন্ন অংশে তল্লাশী ফাঁড়ি বসালো। তল্লাশী করার অজুহাতে এসব স্বেচ্ছাসেবীরা যাদের তল্লাশী করলো তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বাংলা দেশের নামে হস্তগত করলো।

রংপুরের লালমনির হাটে এক উন্মত্ত জনতা একটি ট্রেন থামিয়ে তার অনেক ক্ষতি করে। জাতিগত এবং রাজনৈতিক কারণে ট্রেনের কিছু যাত্রীদের হয়রানী এবং মার-

পিঠ করে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় অধিবাসীদের আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণও করেছিলো।

রাজশাহীতে সিটি টাউন হলে একটা "স্বাধীনতা পতাকা' উত্তোলন করা হয়।

লণ্ডন "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সাংবাদিক কেলিথ্ ক্লার্ক এর পাঠানো একটি বিবরণ ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন---
"খবরে প্রকাশ যে রোব্বার ৭ই মার্চ রাতে যখন শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শেষ প্রান্তে এনে ফেলেছিলেন তখন ঢাকা সম্পূর্ণভাবে অরাজকতার কবলে গিয়ে পড়েছিলো।" উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়—"আওয়ামী লীগ নেতা শেখ, তাঁর আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' বলে নাম দিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য এমন সব শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসি-ডেণ্ট খানের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না।" এ পত্রিকায় শেখ মুজিবর রহ-মানের আর একটি নির্দেশেরও উল্লেখ ছিলো। নির্দেশটি ছিলো---"গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে মুক্তি কমিটি গঠন করা"

১০ই মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ ঘোষণা করলো যে "ব্যাঙ্কের 'লকার'গুলোর কাজ বন্ধ থাকবে" এবং শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশের বাইরে বন্দর কর্তৃপক্ষ কোন রকম সহযোগিতা করবেন না। কুমিল্লায় চা বাগানে গোলযোগ ও সন্ত্রাসের খবর পাওয়া গেলো।

১২ই মার্চ, ১৯৭১

১১ই-১২ই মার্চ রাতে বরিশালের জেল ভেঙ্গে কিছু কয়েদী পালিয়ে যায়। বগুড়ার জেল ভেঙ্গে ৭ জন কয়েদী পালিয়ে যাবার খবরও পাওয়া যায়। কুমিল্লায় ৩০০ কয়েদী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশ গুলী চালায়। পুলিশের গুলীতে ২ জন কয়েদী নিহত ও ১৮ জন কয়েদী আহত হয়।

'মুক্তি ফ্রণ্ট' এবং আধা সামরিক সংস্থাগুলি প্রদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

'মুক্তি ফ্রণ্ট' এর পক্ষ থেকে সাইক্লোষ্টাইলড্ এবং হাতে লেখা প্রচারপত্র গোপনে গোপনে বিলি করা হলো। এসবেরই উদ্দেশ্য ছিলো জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে উসকানীদান।

৫টি সামরিক ট্রাকের একটি দল রেশন নেবার জন্য কুমিল্লা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সশস্ত্র জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

১৩ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় রেলষ্টেশনে, আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা যাত্রীদের 'ঘেরাও' করে পশ্চিম পাকিস্তানের দালাল বলে অভিযুক্ত করে জেরা করতো। কাকরাইলের কাছে এক সরকারী অফিসে দু'বোতল এসিড্ নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সে অফিসে আগুন ধরে যায়।

যশোরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে পাকিস্তান জাতীয় পতাকার জায়াগায় 'বাংলা দেশের' পতাকা উত্তোলন করা হয়।

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ নেতারা দু'জন কয়েদীর মুক্তির জন্য জেল ভাঙ্গার হুমকী দেয়। উল্লেখিত কয়েদী দু'জনকে জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলার জন্য শমসের নগরে গ্রেফতার করা হয়।

১৪ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবর রহমান পূর্বের সব নির্দেশগুলো বাতিল করে দেন এবং "১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে নতুন নির্দেশ সম্বলিত এক কার্য্যক্রম ঘোষণা করেন। এর একটি নির্দেশে বলা হয় যে—"ডেপুটি কমিশনার এবং মহকুমা হাকিমগণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে স্ব স্ব পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখবেন এবং সহযোগিতা করে কাজ করবেন।"

আর একটি নির্দেশে বলা হয় যে, "কাষ্টম বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং যে পরিমাণ কর ধার্যকরা হয়েছে, তা পুরো জমা দেওয়া হলে মাল বের করতে অনুমতি দেবে। এই উদ্দেশ্যে ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ইষ্টার্ণ মার্কানটাইল ব্যাঙ্ক লিমিমটেড (বেসরকারী ব্যাঙ্ক) এ কাষ্টমস কালেক্টর দ্বারা পরিচালিত বিশেষ একাউণ্ট খুলতে হবে। কাষ্টমস কালেক্টরগণ আওয়ামী লীগের মাঝে মাঝে প্রকাশিত নির্দেশ অনুযায়ী এই একাণ্টগুলো পরিচালনা করবেন। এইভাবে যে কর আদায় হবে সেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের একাউণ্টে জমা করা হবে না।

১৫ই মার্চ, ১৯৭১

এক যুক্ত বিবৃতিতে "স্বাধীন বাংলা দেশ" কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৪ জন সদস্য স্বীকার করেন যে—"গাড়ী নিয়ে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন বাড়ীঘর এখনও লুটপাট করছে এবং সংগ্রাম পরিষদের নামে জোরজবরদস্তি করে টকা আদায় করছে।" কিছু সংখ্যক এলাকা থেকে খবর আসছিলো যে ঢাকার বিভিন্ন আওয়ামী লীগ তল্লাশী ফাঁড়ি জাতিগত এবং রাজনৈতিক কারণে যে তল্লাশী চালাচ্ছে তাতে জনসাধারণ বর্বরোচিত ব্যবহারের শিকারে পরিণত হয়েছে।

কুমিল্লায় এক সশস্ত্র জনতা ফেনীর একটি আর্মি ফিল্ড্ ইউনিটের ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চে লণ্ডন এর বি. বি. সি.-র খবরে বলা হয়:---"আজ কাজে যোগ দেবার জন্য যে সামরিক হুকুম জারী হয়েছে, তা অমান্য করার জন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীদের অনুরোধ জানিয়ে শেখ মুজিবর রহমান একটি বিবৃতি দেন। শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর সায়ত্বশাসন চান। তিনি প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিরিশেরও বেশী নির্দেশ জারী করেছেন। এই নির্দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত একটি আদেশ হচ্ছে যে কর কেন্দ্রীয় সরকারকে না দিয়ে, তার সরকারকেই দিতে হবে।

১৬ই মাচ, ১৯৭১

রাজশাহীতে নাটোরের মহারাজ হাই স্কুল থেকে রাসায়নিক দ্রব্য এবং এসিড্ চুরি হয়।

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা একটি অস্ত্রশস্ত্রের দোকান লুঠ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সংবাদদাতা মার্টিন এডেনি-র পাঠানো এক রিপোর্টে আওয়ামী লীগের একটি সংগ্রাম কমিটির বৈঠকের বর্ণনা দেয়া হয়, "সারা প্রদেশে গঠিত এ ধরণের অন্যান্য কমিটির মতো এই কমিটিরও আলোচনার বিষয় ছিলো: তাদের বিবেচনায় ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ "বাংলা দেশে" তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। ৫৮টি গ্রাম গ্রাম থেকে প্রায় শ' তিনেক লোক এই সংগ্রাম কমিটিতে একত্রিত হয়েছে। তারা প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত এবং এ-জন্য তারা এমন একজন গ্রামবাসীর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে, যুদ্ধবিদ্যা যার একমাত্র অধিকার এই যে, সে রাজকীয় ভারতীয় সেনাবাহিনী সার্ভিস কোরে একজন Lance Corporal ছিলো।

হিন্দুস্তানের দৈনিক পত্রিকা স্টেট্সম্যান্ট (১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ, সংখ্যা) আওয়ামী লীগের ১৪ই মার্চ তারিখে জারী করা নির্দেশসমূহের খবর দিয়ে বলেন, মিষ্টার মুজিবুর রহমান, এ-সব নির্দেশ জারী করে বলেছেন যে তিনি "বাংলা দেশ'-এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করছেন।" পত্রিকা আরো জানান, "শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন প্রেসিডেন্ট আমাদের অতিথি হবেন। ঢাকায় পর্যবেক্ষকরা এর এই অর্থ নিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তন থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা বলে মনে করে।

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

১৬ ও ১৭ই মার্চের মধ্যবর্তী রাতে ঢাকার আজিমপুরায় একটি সরকারী অফিসের উপর দুইটি অ্যাসিড বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

১৮ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় মতিঝিল কেন্দ্রীয় সরকারী হাই স্কুলের উপর হামলা চালানো হয় এবং এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।

যশোরে সেনাবাহিনীর একটি শিবিরে দু'জন সামরিক কর্মচারীর উপর এসিডের বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

১৯শে মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় একটি লেভেল ক্রসিংয়ের উপর ময়মনসিংহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি সামরিক যানের উপর এক জনতা অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারীরা অস্ত্র-শস্ত্রসহ ৬জন লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়।

যশোরে বিজলী কেন্দ্রের ক্ষতি সাধন করে বিজলী সরবরাহ ব্যাহত করে দেয়া হয়। যশোর-খুলনা সড়কের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। খুলনায়

৫ই মার্চের হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া প্রায় ৩ শ' লোকের উপর নতুন করে হামলা চালানোর হুমকী দেয়া হয়।

রংপুরে ছাত্ররা কালিগঞ্জ থানার লালিবাড়ী গ্রামে ১২টি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়।

ঢাকা থেকে ২২-মাইল দূরে জয়দেবপুর বাজারে লেভেল ক্রসিংয়ের উপর একটি ট্রেন রেখে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হলে জনতা এবং সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। এরপর সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সৈন্যরা ট্রেনটি একদিকে সরিয়ে দিয়ে তাদের যাওয়ার পথ করার চেষ্টা করলে জনতা তাদের উপর গুলি চালায়। এতে তিনজন সৈন্য মারাত্মকভাবে জখম হয়। সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালালে দু'জন লোক নিহত এবং অন্য ৫ জন আহত হয়। জয়দেবপুর চৌমাথায় উন্মত্ত জনতা আবার সৈন্যদের উপর গুলি চালায়। সৈন্যরা পাল্টা গুলি বর্ষণ করলে একজন লোক নিহত হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে আরো আধাডজন প্রতিবন্ধক-তার সৃষ্টি করা হয়।

২০ ও ২১শে মার্চ, ১৯৭১

যশোরে, হিন্দুস্তান থেকে সাতক্ষীরা হয়ে বিপুল পরিমাণ হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র চোরা-পথে সীমান্তের এপারে আসে বলে খবর পাওয়া যায়। চোরাপথে আনীত অস্ত্রশস্ত্র চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পাঠানো হয় বলেও খবর পাওয়া যায়।

হং কং এর দি ফার ইষ্টার্ণ রিভিউ ২০শে মার্চ (১৯৭১ সাল) সংখ্যায় লিখেছেন "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পরবর্তী উদ্যোগের কথা ভাবছিলেন, তখন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঢাকায় বাড়ীতে আমাদের প্রতিনিধিকে বললেন, "এটাই শেষ দফা।" শেখ মুজিবুরের বাসভবন বাংলাদেশের পতাকা এবং বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। এ কথার অর্থ কি তা জিজ্ঞেস করায় তিনি সেই শ্লোগানটি দিয়ে তার জবাব দিলেন যা তিনি হাজার হাজার বার জনতার সামনে উচ্চারণ করেছেন---'জয় স্বাধীন বাংলা' স্বাধীন বাংলা দীর্ঘজীবী হোক।"

২২শে মার্চ, ১৯৭১

দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি কুশপুত্তলিকাসহ এক উন্মত্ত মিছিল বের করে। কুশপুত্তলিকাটির বুকে তীর বসানো ছিল।

সিলেটের কয়েকটি চা বাগানে হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র এনে রাখা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

'পাকিস্তান দিবসের নাম পরিবর্তন করে 'প্রতিরোধ দিবস' করা হয়। ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী ভবনের চুড়ায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরবর্তে 'বাংলা দেশের' নয়া পতাকা উড়তে দেখা যায়। মুক্তিফ্রণ্টের আধা সামরিক বাহিনী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীদের মার্চ পাষ্ট

এবং কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুসারে ঢাকা টেলিভিশন এই দিন পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন করেনি। মীরপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি এলাকার অধিবাসীরা নয়া 'বাংলা দেশ পতাকা' উড়াতে অস্বীকার করে। পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করলে এসব জায়গায় তাদের উপর হামলা চালানো হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনে এক সশস্ত্র মার্চ পাষ্টে সালাম গ্রহণ করেন। এখানেও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিভিন্ন ছাত্রদল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে এবং মুক্তিপণ দাবী করে। সশস্ত্র জনতা ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে বহির্গামী যাত্রীদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং তাদেরকে হয়রানী করে।

২৪শে মার্চ, ১৯৭১

যুদ্ধংদেহী ছাত্র এবং শ্রমিকরা জনগণকে হিংসাত্মক কাজের উস্কানী দিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় হাতে লেখা এবং সাইক্লোষ্টাইল করা প্রচারপত্র বিলি করা শুরু করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের জেলা কমিটি ঐ ধরণের একটি প্রচারপত্র বিলি করে, যাতে লেখা ছিল:

> "পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এগিয়ে চলছে। এই দাবানলকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন। দেশপ্রেমিক বিপ্লবী জনগণ! হাতিয়ার তুলে নিন। শত্রু সৈন্যকে বাধা দিন এবং তাদেরকে নির্মূল করুন। সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে মুক্ত এলাকাগুলো রক্ষা করুন।"

"দেশবাসী বন্ধুগণ! হাতের কাছে যে অস্ত্র পান তাই হাতে তুলে নিন এবং শত্রুদের অগ্রগতি বন্ধ করুন। যে সব জায়গা শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে নেই সে সব জায়গার সড়ক, সেতু, রেলযোগাযোগ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করে দিন। ঘরে ঘরে হাত বোমা ও মলোটোভ বোমা (Molotov Cocktail) প্রস্তুত রাখুন। যদি আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয় কিংবা যদি আমরা শত্রু কর্তৃক সরাসরি আক্রান্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

"মনে রাখবেন, পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে যার জন্যে দীর্ঘ সময়েও প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই, গেরিলা যুদ্ধ কৌশল ছাড়া আমরা শত্রুদের প্রতিহত করতে সক্ষম হবো না, যে কোন মূল্যে মুক্ত এলাকাগুলো রক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত থাকুন।

পূর্ব বাংলার দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়নি, বরং এটাই কেবল শুরু। আমাদেরকে দুর্বল করার জন্যে শত্রুরা অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ব বাংলার জয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা পাকিস্তানী উপনিবেশদের জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলবো। স্বাধীন পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ।"

রংপুরে উত্তর সৈয়দপুরের গোলাহাট থেকে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায়। লাঠি-সড়কি অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আট হাজার লোকের এক উন্মত্ত জনতা সৈয়দ-

পুর অভিমুখে যাত্রা করে সেখানকার অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করার জন্যে, ৫০টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে ব্যাপকভাবে এসিড বোমা তৈরীর খবর পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের সর্বত্র ব্যারিকেড এবং বিভিন্ন রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকার ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত পালমার্টিন-এর পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বিভিন্ন বিপ্লববাদী দল ছাত্রদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া শুরু করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বহু গ্রামে একটি গণবাহিনীর সূচনা হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই গণবাহিনীর ভবিষ্যৎ কাজ হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা। ইতিমধ্যেই, গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন ল্যাবরেটরী থেকে চুরি করা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরী করা পেট্রোল বোমা ও অন্যান্য হাতে তৈরী বোমা পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী ঢাকায় প্রথম বারের মতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সৈয়দপুরে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে রাইফেল, গাদাবন্দুক, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত জনতার চারটি দল সৈয়দপুর অভিমুখে যাত্রা করে এবং স্থানীয় এলাকা কোলাহাটের উপর আক্রমণ চালায়। এতে তিন জন লোক নিহত ও ১৭ (সতের) জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে দু'জন বুলেট আঘাতপ্রাপ্ত এবং অন্য ৭-জন বন্দুকের গুলিতে আঘাত পায়। বাকী কয়জন আহত হয় লাঠি সোটার আঘাতে। ৫০টি বাড়ীও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সৈন্যবাহিনী গুলি ছুড়তে বাধ্য বাধ্য হয়, ফলে তিন জন লোক জখম হয়। পরে, আরেক উন্মত্ত জনতা সৈয়দপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের উপর আক্রমণ চালায়। তারা সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে। সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালালে ৫-জন লোক আহত হয়।

অপরদিকে আরেক জনতা সৈয়দপুর—দিনাজপুর সড়কে ডাক বিভাগের একটি গাড়ীর উপর হামলা চালায়। তারা ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টরকে গাড়ী থেকে টেনে নামায়। কণ্ডাক্টরকে ঘটনাস্থলেই পিটিয়ে হত্যা করা হয় আর ড্রাইভারটি মারাত্মক ভাবে আহত হয়।

চট্টগ্রামে ক্যাণ্টনমেণ্টে সামরিক বাহিনীর লোকদের যাতায়াত এবং অস্ত্রশস্ত্র আনা নেয়া বন্ধ করার জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আগ্রাবাদগামী রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। প্রধান সড়কে কয়েকটি ট্রেঞ্চ খনন করা হয় এবং যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যে রাস্তার উপর ট্রাক ও লরি, পীচের ড্রাম, ডাষ্টবিন ও ইট-পাটকেল ফেলে রাখা হয়।

আওয়ামী লীগের ব্যাপক সশস্ত্র প্রস্তুতি আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান সাবেক কর্ণেল উসমানীকে 'বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং

তিনি সরাসরিভাবে শেখ মুজিবের কর্তৃত্বাধীনে থাকবেন। শেখ মুজিবুর রহমান প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদেরকে নিজ পক্ষে তালিকাভুক্ত করার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মজিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জমকে নিয়োগ করেন। তালিকা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা হয় এবং তা আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে রাখা হয়। অন্যদিকে তাদের হাতে অস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর এ জন্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা এবং যশোরের অস্ত্র দোকানগুলো লুট করা হয় এবং তা বিদ্রোহীদের ব্যবহারের জন্যে সব বড় বড় শহরে মওজুত করা হয়। একমাত্র ঢাকা পুলিশ ষ্টেশনেই গুলিভর্তি ১৫ হাজার রাইফেল জমা করা হয়।

বিভিন্ন ইপিআর এবং ইবিআর বহির্ফাড়ির মধ্যে অয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের সাহায্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এক ইউনিট থেকে দ্রুত অন্য ইউনিটে নির্দেশ পাঠানো হয়। বৃহত্তম পরিচালন সদর দপ্তর ছিলো চট্টগ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সেণ্টারে।

পরিচালনা কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা হয় এবং এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যে, ঢাকার আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয় সেগুলো হচ্ছে:

(ক) আকাশ কিংবা সমুদ্রপথে পাকিস্তানী সৈন্যের আগমন রোধ করার জন্যে ইবিআর বাহিনী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম দখল করবে।

(খ) ইপিআর, পুলিশ এবং সশস্ত্র রাজাকারদের সাহায্যে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের অবশিষ্ট সেনারা বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং ফাঁড়িতে সশস্ত্র সৈন্যদেরকে নির্মূল করবে।

(গ) ইপি আর সীমান্তের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো দখল করবে এবং তা বহিঃসাহায্যের জন্যে খোলা থাকবে।

(ঘ) অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা হবে হিন্দুস্তান থেকে। ...

(ঙ) আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো দখল এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যদস্ত করার প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভ করা মাত্রই হিন্দুস্তানী সৈন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

শুক্রবার দিন খুব ভোরে এই সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হবে বলে সময় ধার্য করা হয়।

২৫শে মার্চ দিনগত রাতে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটন এবং "স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের" অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে প্রেসিডেণ্ট পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। সেনাবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে এবং তাঁরা হিন্দুস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইষ্ট পাকিস্তান পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী লোকদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান দখলের সশস্ত্র পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। পরবর্তী

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তান সংলগ্ন সীমান্ত বরাবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। এই সময়ে যেসব এলাকা সামরিকভাবে বিদ্রোহী এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে আসে সে সব যায়গায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব যা পহেলা মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এর ফলে এক লাখেরও বেশী পুরুষ, মহিলা ও শিশুর জীবননাশ হয়। তাছাড়া, বিপুল সংখ্যক সরকারী, ও বেসরকারী ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিনষ্ট এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতি সাধিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুদ্ধবাজ কর্মী এবং ইপিআর ও ইবিআর এর বিদ্রোহীরা নরঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অশুভ ইচ্ছার যারা বিরোধিতা করে তারাই তাদের হত্যার শিকারে পরিণত হয়। অবর্ণনীয় বর্বরোচিত কাজ সংঘটিত হয়। বগুড়া জেলার শান্তাহারের একটি এলাকায় ১৫ হাজারেরও বেশী লোককে ঘেরাও করা হয় এবং তাদেরকে সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়। মহলাদেরকে উলঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয় এবং মাকে তার নিজ সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়। চট্টগ্রামে ১০ হাজারেরও বেশী লোককে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ছোট একটা এলাকাতেই আড়াই শো মহিলা ও শিশুকে বেয়নেট দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সিরাজগঞ্জে, সাড়ে তিনশো মহিলা ও শিশুকে একটি হলঘরে তালাবদ্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, ফলে তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। ময়মনসিংহে সানকিপাড়া এলাকায় দু'হাজার পরিবারের একটি কলোনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়। পুরুষদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে গুলি করে মারা হয় এবং মহিলাদের দিয়ে কবর খোড়ানো হয় ও তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। ঐ ধরণের বর্বরোচিত ও অমানুষিক কয়েকটি ঘটনার কথা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার কয়েকটির অংশ-বিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

"বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী মুসলমান প্রতি মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার কথা অনুধাবন করছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে, বাঙালীরা এই বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাদের উপর চড়াও হয়েছে।"

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান", নয়াদিল্লী,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১
পিটার হাজেলহার্ষ্ট

"দেশবিভাগের সময় যে সব হাজার হাজার অসহায় মুসলিম উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তাদেরকে গত কয়েক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রদ্ধ বাঙালীরা হত্যা করেছে।

এ সপ্তাহে যে সব বিহারী মুসলমান উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে হিন্দুস্তানে চলে আসে তারা এই হত্যার কথা জানিয়েছে। আজ একজন তরুণ ব্রিটিশ টেকনিশিয়ান হিলিতে হিন্দুস্তান পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে। সেও এই হত্যাকাণ্ডের সত্যতা প্রকাশ করেন।

"দি টাইমস", লণ্ডন, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১।

"গতকাল কোলকাতায় যে ব্রিটিশ জাহাজ নোঙর করা হয় তার যাত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ব্যাপক নরহত্যা এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার কথা জানিয়েছেন।

লেয়ন লামসডেন নামে মার্কিন সাহায্য পরিকল্পনার একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, প্রধানতঃ বাঙালী অধ্যুষিত চট্টগ্রাম শহরে গত সপ্তাহে সেনাবাহিনীর লোক আসার আগে একটানা দু'সপ্তাহ ধরে বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।

"নর্দার্ণ ইকো", ডারলিংটন, ডারহাম, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১।

"যখন ইপিআর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস) বিদ্রোহ করলো তখন তারা প্রথম যে কাজে হাতে দিলো তা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে অবাঙালীদের উৎখাত করা।

"১০ থেকে ১৫ হাজার লোক নিয়ে গঠিত ইপি আর-এর শতকরা ৪০ জন হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী। তাদের বেশীর ভাগই অফিসার।

"ইপিআর-এর লোকেরা হিন্দুস্তানের সীমান্ত তল্লাসী শহর হরিদাসপুরের কাছে সীমান্ত বরাবর এক গরুরগাড়ী বোঝাই লাশ খালাস করে।"

"ফার ইষ্টার্ণ ইকনোমিক রিভিউ", হংকং, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১।
টি আই এস জর্ড।

"শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা যায় যে, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন কিছু কিছু বাঙালী বিহারীদের ঘরবাড়ী লুট করে এবং তাদেরকে হত্যা করে।"

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" নিউ ইয়র্ক,
১০ই মে, ১৯৭১ (ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন)

"স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কের ইউরোপীয় ম্যানেজার বলেন, অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে সেনাবাহিনীর সময়মত উপস্থিতির জন্যে প্রতিটি ইউরোপীয় জীবিত আছেন, না হলে এ কাহিনী বলার জন্যে আমি বেঁচে থাকতাম না।"

"নিউ ইয়র্ক টাইমস", নিউ ইয়র্ক ১১ই মে, ১৯৭১।
(ম্যালকম ব্রাউন)

"এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, উন্মত্ত জনতা অবাঙালীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ী জালিয়ে দেয়। এসব অবাঙালীদের অধিকাংশই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেড় হাজার বিধবা ঐ এতিম শিশুর নিদারুণ কাহিনীর কথা উল্লেখ করেন।

ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের একটি মসজিদে আশ্রয় নিতে যাওয়ার সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে সনাক্তকৃত সশস্ত্র লোকেরা তাদের স্বামী ও পিতাদের হত্যা করে।

"সিলোন ডেইলী নিউজ", কলম্বো, ১৫ই মে, ১৯৭১।
(মরিস কুয়েনট্যান্স)

"গতকাল এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীতে সফরকারী সাংবাদিকরা বলেছেন, গোলাগুলির ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বিদ্রোহীরা যে বেসামরিক লোককে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

"সাংবাদিকরা ইস্পাহানী পরিবারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মালিকানাধীন পাট কলে একটি বিরাট কবর দেখত পান যেখানে ১৫২ জন অবাঙালী মহিলা ও শিশুকে একযোগে সমাহিত করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা তাদেরকে গতমাসে কারখানার চিত্তবিনোদন কেন্দ্রে হত্যা করে।

"বুলেট ঝাঝরা এই ক্লাব কক্ষের মেঝেতে এখনও রক্তমাখা জামা-কাপড় ও বাচ্চাদের খেলনা ছড়িয়ে আছে। দায়িত্বশীল মহল বলেন, চট্টগ্রামে হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আগত হিন্দুস্তানী মুসলমানদেরকে ২৫শে মার্চ অর্থাৎ যেদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু হয় সেদিন থেকে ১১ই এপ্রিল সেনাবাহিনী কর্তৃক শহর পুনর্দখল করার দিন পর্যন্ত পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়।

"স্থানীয় বাসিন্দা সাংবাদিকদের একটি অগ্নিদগ্ধ ভবন দেখায়। তারা জানায়, বাঙালীরা এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সাড়ে তিনশো পাঠানকে পুড়িয়ে মেরেছে।"

"ওয়াশিংটন পোষ্ট", ওয়াশিংটন, ১২ই মে ১৯৭১।
(এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট)

"বন্দর শহর চট্টগ্রামে একটি পাটকলের চিত্তবিনোদন ক্লাবে রক্তমাখানো খেলার পুতুল এবং মলমূত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালীরা এখানে ১শো ৮০ জন মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। উগ্র স্বাদেশিকতার উন্মাদনায় বাঙালীরা কিছু সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানীকে খুন করে।

বাঙালী বেসামরিক লোক এবং মুক্তি সৈন্যরা হিন্দুস্তানের বিহার রাজ্য থেকে আগত মোহাজিরদের পাইকারী হারে হত্যা করা শুরু করে এবং বাজার ও অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকভাবে ছুরি মারা, গুলি চালনা এবং আগুন লাগানো প্রভৃতি হিংসাত্মক কাজ চালায় আর নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুস্তানের ভূমিকা

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিদের সংগে হিন্দুস্তানী সোগসাজসের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেলো ১৯৬৭-তে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হোলো। কয়েক-জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত ছিলেন ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বর থেকেই—যখন "দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার উদ্দেশ্য একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়েছিলো। আগরতলা ষড়যন্ত্রের কর্ম পরিকল্পনার প্রধান বিষয় ছিলো সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগারগুলো দখল করে সেগুলোকে অচল করে দেওয়া। পরিকল্পনা করা হয়েছিলো যে এ কাজ করা হবে 'কমাণ্ডো' কায়দায়, এবং দলের লোকসংখ্যা কম বলে আক্রমণ করা হবে অতর্কিতভাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিদের সংগে হিন্দুস্তানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুস্তানের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার কথা ছিলো। ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে হিন্দুস্তানের আগরতলায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৭-র ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের একজন প্রকাশ করে যে হিন্দুস্তান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তা ছাড়াও হিন্দুস্তান বলেছে যে হিন্দুস্তান সরকার "চূড়ান্ত দিনে" পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগকারী আকাশপথ ও সমুদ্রপথ বন্ধ করে ফেলবে।

হিন্দুস্তান এই পরিকল্পনা কার্যকরী করলো ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। হিন্দুস্তান বিমান লাইনের একটি ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানের গতি জোর করে পরিবর্তন করে তাকে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হোলো। গতিপরিবর্তনকারীরা পরে বিমানটি ধ্বংস ক'রে ফেললো। এই ঘটনাকে ছুতো হিসেবে অবলম্বন করে হিন্দুস্তান সরকার তার এলাকার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানের চলাচল বন্ধ করে দিলো। এতে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনার স্থষ্টি হোলো।

সংশ্লিষ্ট বিমানের যাত্রীদের নিরাপত্তা ও হিন্দুস্তান তাদের আশু প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পাকিস্তান সরকার সম্ভব সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হোলো। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উদ্‌ঘাটিত হোলো যে এ ঘটনাটি হিন্দুস্তানী এজেণ্টরা ইচ্ছে ক'রেই ঘটিয়েছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুস্তানী সীমানার ওপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করার জন্য একটা ছুতো বের করা এবং পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে অস্থবিধে ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তোলা। এ জন্যে তারা এক সময়ের অপেক্ষায় ছিলো যা ছিলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আলোচনার সংকটকাল।

"গার্ডিয়ান" পত্রিকার ১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত হোলো : "তিনি (মুজিব) প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান ও তাঁর জেনারেলদের বলছেন : জনসাধারণ আমাকে ভালবাসে ; সুতরাং আমাকে স্পর্শ করবেন না। তিনি একথা বলছেন, কারণ তিনি জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্যসংখ্যা এতো কম যে তারা বড় রকমের কিছু করার সাহস পাবে না। আর যেহেতু হিন্দুস্তানের ওপর দিয়ে বিমানচলাচল বন্ধ, কাজেই সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোও অসম্ভব।"

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের হস্তক্ষেপের কারণ বহু। আর এই সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে অতীত ইতিহাসে। হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে এই যে হিন্দুস্তান কখনও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সত্যি সত্যি মেনে নেয়নি। এমনকি বল্লভভাই প্যাটেলের মতো শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল নেতারাও আশা পোষণ করতেন যে "হিন্দু মাতৃভূমি" রূপে ভারত পুনরায় যুক্ত হবে। এই আশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি। সে হঠাৎ পাকিস্তানের জমিতে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলো ; পাকি-স্তানের অর্থনীতিকে ব্যাহত করার জন্য সে লাখ লাখ মুসলমানকে ঘর-ছাড়া ক'রে পাকিস্তানে ঠেলে দিলো। সে জুনাগড় দখল করে নিলো এই অজুহাত দেখিয়ে যে তার অধিবাসীরা হিন্দু ; আবার কাশ্মীর দখল করার পেছনে সে অজুহাত দেখালো যে তার শাসনকর্তা হিন্দু। ১৯৬৫ সালে সে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানায় সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানকে আঘাত হানলো। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সমাপ্তি ত্বরান্বিত ক'রে সে পূর্ব পাকিস্তানের ২ কোটি ৩০ লাখ লোকের জীবনযাত্রা এবং সারা দেশের অর্থনীতিকে বিপদাপন্ন করে তুললো। এখন পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে সে আবার পাকিস্তানের সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে হিন্দুস্তানী সেনাবাহনীর একটা অল্লেখযোগ্য অংশকে পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন করা হলো। আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনের সময় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সৈন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষার্ধে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করা হোলো পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে। এদের সাহায্যের জন্যে নিয়োগ করা হোলো মাউণ্টেন ব্রিগেড প্যারাস্যুট ব্রিগেড, জংগী বোমারু বিমান এবং বিমান পরিবহন ইউনিট।

সংগে সংগে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধীদের সাহায্যের জন্যে, হিন্দুস্তান সেনা-বাহিনীর বহু সৈন্যকে বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হোলো। জেট জংগী বিমান এবং পরিবহণ বিমানও সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন বিমান ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হোলো।

পশ্চিম বাংলায় পাঁচ ডিভিশনের ওপর সৈন্য সমাবেশ ছাড়াও, সীমান্ত রক্ষী বাহি-নীর কয়েকটি অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ানও মোতায়েন করা হোলো। এর আগেই কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করা হ'য়েছিলো। এই ভাবে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সমাবিষ্ট হোলো প্রায় পঁচিশটি হিন্দুস্থানী ব্যাটেলিয়ান। এইসব ব্যাটেলিয়ান যাতে বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে পারে, সেজন্য B. S. F. এর (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হোলো ; জীপ এবং অন্যান্য যানবাহনের রং বদলে দেওয়া হোলো। দিল্লী থেকে বিমান যোগে আরও B. S. F. সৈন্য আনানো হোলো, সব B. S. F. কোর্স বাতিল করে দেওয়া হোলো ; পুলিশ বিভাগে ছুটি বন্ধ করে দেওয়া হোলো।

হিন্দুস্তানী এলাকার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করেও হিন্দুস্তান ক্ষান্ত হোলো না। সে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রপথেও বাধা স্থষ্টি করতে চাইলো। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের দু'তারিখে হিন্দুস্তানী নৌঘাঁটি দোয়ারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে হিন্দুস্তানী যুদ্ধজাহাজ, "The Ocean Endurance" নামক একটি পাকিস্তানী সওদাগরী জাহাজকে হয়রান করলো। হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে জাহাজটিকে করাচী ফিরতে হোলো। তিনি দিন পর হিন্দুস্তানী যুদ্ধজাহাজ আর একটি পাকিস্তানী জাহাজকে হয়রান করলো। এটি ছিল 'সফিনায়ে আরব'। জাহাজটি হাজীদের নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলো। হিন্দুস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে কার্যরত আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী একটি নতুন ইউনিট অনুশীলন চালাতে গিয়ে উপকূল থেকে ১২৩ মাইল দূর পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে থাকে। এইভাবে তারা পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানকে আরও দক্ষিণ দিক দিয়ে যেতে বাধ্য করে।

হিন্দুস্তানী বিমানবাহিনীও এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে যা থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে তারা একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তে শিকারী জংগী বিমান ও অতিরিক্ত পরিবহণ বিমান মোতায়েন করা হোলো পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত সংলগ্ন ঘাঁটিগুলোতে প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হোলো। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী জাহাজগুলোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ বিমান মোতায়েন করা হোলো। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত এলাকা জুড়ে ব্যাপকভাবে ফটো গ্রহণের কাজ চালানো হয়।

হিন্দুস্তানী সীমান্ত বাহিনীর লোকেরা স্থলপথে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে শুরু করলো এবং এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হোলো। হিন্দু-স্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে লাগলো। এমন বহুসংখ্যক রাইফেল হস্তগত করা হয়েছে যাতে হিন্দুস্তানী রাইফেল ফ্যাক্টরী ইসাপুরের ছাপ রয়েছে। গোলাবারুদে পাওয়া গেছে হিন্দুস্তানের কিরকী ফ্যাক্টরীর ছাপ।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দুস্তানের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৭৬,৮১,৮৩,১০১, ১০৩ ও ১০৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগানো হ'য়েছিলো। পরবর্তী তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ ছাড়া আরও

দু'টি ব্যাটেলিয়ানকে কাজে লাগানো হ'য়েছিলো। ৭৩ নম্বর B. S. F. ব্যাটেলিয়ানকে কুচবিহারের মেখিলগঞ্জ এলাকায়, ৭৭ নম্বর B, S. F. ব্যাটেলিয়ানকে দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং ১৮ নম্বর B.- S. F. ব্যাটেলিয়ানকে যশোরের পশ্চিমে বনগাঁয় নিযুক্ত করা হয়েছিলো। হিন্দুঁস্তান সেনবাহিনীর সিনিয়ার কমাণ্ডাররা যুদ্ধকার্য পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে একজন ছিলো ৬১ নম্বর মাউণ্টেন ব্রিগেডের কমাণ্ডার। সম্প্রতি এই ব্রিগেডটিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাঙামাটির ২৫ মাইল উত্তর পূর্বে ডিমাগিরিতে মোতায়েন করা হয়েছে।

হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ার পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বহু পরিমাণ হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত ক'রেছে। নওয়াবগঞ্জ এলাকায় সেনাবাহিনী একটি গোপন পত্র পেয়েছে। পত্রটি "ভারী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ" সম্পর্কে সীমান্তের ওপারে হিন্দুস্তানী এজেণ্টের সংগে আলোচনা বৈঠকের বিষয়ে লিখিত। লেখক আওয়ামী লীগের একজন নেতা।

পূর্ব পাকিস্তান সংকটের একেবারে গোড়া থেকেই যে হিন্দুস্তান এর সংগে জড়িত ছিলো, তার প্রমাণ এখন হিন্দুস্তান ও অন্যান্য বিদেশী তথ্য মাধ্যমের পরিবেশিত সংবাদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। একজন হিন্দুস্তানী সাংবাদিক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৯ তারিখে কোলকাতা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেন যে বিদ্রোহীরা (তথাকথিত 'মুক্তি বাহিনী') হিন্দুস্তানের সংগে যোগসূত্রে স্থাপন করেছিলো। বোম্বাইর 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে সাংবাদিক কুষ্টিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি বাহিনীর কমাণ্ডারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কমাণ্ডার তার নাম প্রকাশ করতে চায়নি। কমাণ্ডার বলেছে, নদীয়ার সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়ায় বিদেশী সৈন্যদের দু'টি ইউনিট নিহত হওয়ার পর, অথবা কুষ্টিয়া থেকে তাদের অপসারণের পর, কমাণ্ডার সংগে সংগে কোলকাতায় টেলিফোন করে। সে প্রথমে কথা বলে মিঃ অজয় মুখার্জীর সংগে---সেই সপ্তাহেরই শেষের দিকে যার পশ্চিম বাংলার নতুন মুখ্য উজীর হওয়ার কথা। এরপর কমাণ্ডার কয়েকজন সাংবাদিকের সংগে কথা বলে।

'বাংলা দেশ' এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে হিন্দুস্তানের কয়েকটি প্রাদেশিক পরিষদে সরকারীভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হোলো। এই প্রদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তামিল নাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, ও ত্রিপুরা। পশ্চিম বাংলার ডেপুটি মুখ্য উজীর বললেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও বাংলা দেশের প্রতি স্বীকৃতি জানায়নি, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আমরা বাংলা দেশের প্রতি এখন থেকেই স্বীকৃতি জানাচ্ছি।

এদিকে, পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে হিন্দুস্তানী প্রধান উজীর নিজেই একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে হিন্দুস্তানী পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদই প্রস্তাবটি গৃহীত হোলো। এই প্রস্তাবে "পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করা হয় এবং তাদের (বিচ্ছিন্নতাবাদীদের) আশ্বাস দেওয়া হয় যে "হিন্দুস্তানের জনগণ তাদের সংগ্রাম সর্বান্তঃকরণে সহানুভূতি জানাবে ও সমর্থন যোগাবে।"

হিন্দুস্তানের পার্লামেণ্টে গৃহীত "বাংলা দেশ" সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিলে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক "সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত" হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসংগে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পশ্চিম বাংলা ইউনিটের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ কে. কে. শুকলা বললেন --"শেখ মুজিবুর রহমান যে যুদ্ধ করছেন, সেটা হিন্দুস্তানেরই যুদ্ধ।"

হিন্দুস্তানী প্রধান উজীর শেখ মুজিবুর রহমানের সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহের আবেদন জানালেন। হিন্দুস্তানের সর্বত্র সরকারী সমর্থনপুষ্ট কমিটি গঠিত হোলো। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য তারা চাঁদা তুলতে শুরু করলো। বিহার প্রদেশের মুখ্য উজীর কর্পুরী ঠাকুর ঘোষণা করলেন যে তার সরকার এই তহবিলে ২৫ লাখ টাকা দান করবে। মুখ্য উজীর ঠাকুরের উধৃতি দিয়ে বোম্বাই "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রিকার ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবর অনুসারে, "বাংলা দেশের মুক্তি বাহিনীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ সহ সম্ভব সর্বপ্রকার সাহায্য দানের দৃঢ় সংকল্পের কথা" ঠাকুর মহাশয় পুনরায় দৃঢ়তার সংগে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন: "পরিণতি যাই হোক না কেন, বাংলা দেশের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আমি অটল।"

শেখ মুজিবের 'মুক্তি বাহিনী'র জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠানোর জন্য এই সব অর্থ সংগ্রহ করা হোলো।

এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে সাংবাদিকরা হিন্দুস্তানী প্রধান উজীরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এসব অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের পাঠানোর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন: "তিনি এ ব্যাপারে প্রাকশ্যভাবে কিছু বলতে পারেন না, কারণ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" ষ্টেটসম্যান এবং অন্যান্য কয়েকটি হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য হিন্দুস্তানী এখনও বিদ্রোহীদের নিযুক্ত করে যাচ্ছে এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে চলেছে। লণ্ডন টাইমস এর একজন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের একটি 'রিক্রুটিং' সেণ্টার পরিদর্শন করেছেন।

১৯৭১ সালের ১৮ই জুন তারিখে প্রেরিত এক খবরে তিনি বলেন যে শিক্ষা কেন্দ্রের অফিসার ইন চার্জ দাবী করেন যে তথাকথিত "বাংলা দেশ" বাহিনীর সবগুলো ট্রেনিং কেন্দ্রই "বাংলা দেশের কোথাও" অবস্থিত। কিন্তু লণ্ডন টাইমস এর প্রতিনিধি যখন জানতে চান যে এগুলো পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঠিক কোন বিশেষ জায়গায় অবস্থিত, তখন উত্তরে বলা হয় যে, "এটা একটা সামরিক গোপনীয় তথ্য।" লণ্ডন টাইমস এর প্রতিনিধি আরও জানান: "হিন্দুস্তানের পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে এ রকমের প্রায় শ'খানেক কেন্দ্র রয়েছে।" তিনি আরও বলেন যে রিক্রুটিং সেন্টারগুলো এমন সব জায়গায় অবস্থিত, যেগুলো "বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে এগুলো উদ্বাস্তুদের রেজিস্ট্রেশন অফিস।" লণ্ডন টাইমস এর প্রতিনিধির খবর অনুসারে, "যাদের রিক্রুটিং সেণ্টারে নিয়োগের জন্যে আনা হয়, তাদের সাবধান করে দেওয়া হয় যে মুক্তি ফৌজ